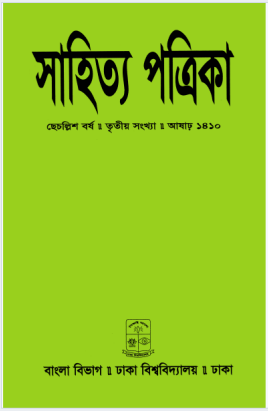

Vol. 46 | No. 3 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক

Volume	46
Issue	3
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শাহনাজ নাসরিন ইলা
Published online	June 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i3.335
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i3.335
Pages	153-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ
বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক

Check for updates

শাহনাজ নাসরিন ইলা *

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩) স্বনামধন্য কবি, নাট্যকার ও সংগীত রচয়িতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকারদের অন্যতম দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম ১৮৬৩ সালের ১৯শে জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। তাঁর পিতার নাম দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার কনিষ্ঠ পুত্র। কার্তিকেয় চন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত খেয়াল গায়ক, গীত রচয়িতা, সাহিত্যিক, সংগীতবিশারদ, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত মানুষ। পারিবারিক ঐতিহ্যগত সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিবেশে দ্বিজেন্দ্রলাল লালিত-পালিত ও বর্ধিত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও কৃতী ছাত্র। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এম. এ. পাশ করে কৃষিবিদ্যা শিক্ষায় সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলাত গমন করেন। বিলাতে অবস্থান কালে Lyrics of Ind নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং এসময়েই তিনি পাশ্চাত্য সংগীতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ও নিয়মিতভাবে পাশ্চাত্যসংগীত শিক্ষা ও চর্চা করেন। বিলাত থেকে ফিরে তিনি ডেপুটি মেজিস্ট্রেট পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৮৮৭ সালে সুরবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি মুঙ্গেরে নিযুক্ত হন। বিশিষ্ট গায়ক ও সংগীতবিদ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তখন মুঙ্গেরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্যে ও ওস্তাদের অধীনে দ্বিজেন্দ্রলালের রাগসংগীত চর্চা চলতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ টপ্পা ও টপখেয়াল অঙ্গে পারদর্শী ছিলেন। টপ খেয়াল সংগীত রূপটি তখন সদ্য প্রচারিত। বিখ্যাত রমজান খাঁ কলকাতার আসরে আসরে টপখেয়াল গাইতে শুরু করেছেন। মুঙ্গেরে অবস্থান কালে তিনি বহু গান ও কীবতা রচনা করেন। তাঁর হাসির গান রচনার সূত্রপাত এখান থেকেই। এ সময়ে রচিত গানসমূহ 'আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। ১৮৯৭ সালে পুত্র দিলীপকুমারের জন্ম হয়। ১৮৯০ সালে তাঁর পত্নী বিয়োগ ঘটে। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে পত্নীবিয়োগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

★ প্রভাষক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘটনা। পত্নীবিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য ও সংগীত জীবনের আনন্দ ও প্রেমময় সময়। পত্নীবিয়োগের পর থেকে ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের জগত থেকে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে আনেন। তখন থেকে তাঁর রচনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে বেদনা ও উদ্দীপনা। এ সময় থেকেই নাট্য রচনায় তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ১৭ই মে ১৯১৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আকস্মিক সন্নাস রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।

দ্বিজেন্দ্রলালের বেশ কিছু গান রচিত হয়েছে সমকালীন পেশাদারী মঞ্চের প্রয়োজনে। তাঁর গানের আবেদন কথা ও সুরের সুচয়ন মুগ্ধ করে মধ্যবিত্ত বাঙালী চিত্ত। দেশাত্মবোধক, প্রেম, ও হাসির গান রচনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বিশেষ করে ব্যঙ্গ ও হাস্যরসোচ্ছল সংগীত রচনায় তিনি প্রসিদ্ধ ও পথিকৃত ছিলেন। প্রকৃতির পটভূমিকায় কখনো তাঁর দেশাত্মবোধ ও প্রেমের অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮২ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম গীত সংকলন 'আর্যগাথা প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের গানসমূহ তাঁর বার থেকে সতের বছরের মধ্যে রচিত। আর্যগাথার সাংগীতিক মূল্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন— 'আর্যগাথার সকল গীতগুলি কবিতার ছন্দোবন্ধেই রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতি গীতই সম্পূর্ণ শাস্ত্রতঃ সুরে গেয়। সঙ্গীত স্বরে, কবিতা ভাষায়, একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আমরা গাহিবার সময় প্রায়ই ভাষা ও স্বর মিলিত করি। আমি যদি গীতগুলি প্রতি পাঠকের নিকট গাইয়া বেড়াইতে পারিতাম, তাহা হইলে গীতের সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য স্বরের উপরই অধিক নির্ভর করিত। কিন্তু গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে। সেজন্য ইহাদের ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে এত দৃষ্টি বোধদয় আপত্তিকর হইবে না। যাহা হউক, ইহার জন্য গীতগুলি গাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।[১] গানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন "যাহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেম-গীতিকেই গীত মনে করেন, 'আর্যগাথা' তাহাদের জন্য রচিত হয় নাই এবং তাহাদের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা সংকুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জন করেন, যদি অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে 'আর্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে।[২] এই কাব্যের রচনাগুলো দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিভার প্রথম প্রকাশ। পরবর্তীতে যে পূর্ণ আবির্ভাব তারই পরিচয় বহন করেছে এই গানগুলো।

১৮৯৩ সালে দশ বছর পর প্রকাশিত হয় 'আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ'। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তরও হইয়াছে— কাহার না হয়? আজি আমি আর পাঠাধ্যায়ী অনূঢ়, জগতের দুরস্থ পরিদর্শক বিস্মিত বালক নই। 'আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল, উঠেছে আজ নতুন বাতাস, ফুটেছে আজ নতুন আলো'—মলয়ানিলসম্পৃক্ত, প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয় কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুহুধ্বনি।[৩] এ উত্তরণ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্র-সমালোচক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগে বেদনার চেয়ে বিলাস ছিল বেশি, সাধের চেয়ে সাধ্য ছিল অনেক কম।... কিন্তু দশ বৎসর পরে কবি ত্রিশ বছরের বিবাহিত যুবক প্রকৃতির ছায়াচ্ছন্ন জগতে তিনি আর বিচরণ করেন না, তিনি মানবলোকে প্রবেশ করেছেন। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর স্বতস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম গীতধর্মিতা। দ্বিজেন্দ্রলালের মানসলোকে যে রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি ছিল, তাই বিবাহ পরবর্তী জীবনে সৌন্দর্য ও প্রেমের নিবিড় উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে।... এক তন্দ্রাতুর সুখ লাস্যময় অনুভব কবিতা ও গানগুলির উপরে এক সূক্ষ্ম সুরের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। কবির স্বপ্ন বিহ্বল মনের এমন সুরধর্মী ও আত্মতন্ময় প্রকাশ তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলোতেও দুর্লভ। বিশ্বপ্রকৃতি ও প্রেমের রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আবার প্রকৃতির প্রসাধন বৈচিত্র্যে কবি তাঁর প্রেয়সীকে নতুন আভরণে সাজিয়ে তুলেছেন।... উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ, চিরন্তন প্রেমরহস্যের গভীর উপলব্ধি এই প্রণয় সংগীতগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[৪] দ্বিজেন্দ্রলাল বহু বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের প্রধান প্রধান বিষয় হলো— হাস্য-কৌতুক, স্বদেশপ্রীতি ও প্রেম। নিচে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও সুর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

হাস্যগীতি : হাস্যরস নবরসের অন্তর্গত একটি রস। সংগীতের ক্ষেত্রে এই রস বেশি প্রচলিত নয়। মূলত এটি পাশ্চাত্য সংগীতের একটি ধারা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা সংগীত ধারায় এই সংগীতের প্রবর্তক। তাঁর হাসির গানগুলোকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রথমতঃ ব্যঙ্গ রস— এসব গান রচিত হয়েছে সমাজের নানা কুসংস্কার, বাধানিষেধ, রাজনৈতিক বিষয় ও পাশ্চাত্য জীবন যাপনের অন্ধ অনুসরণকে ব্যঙ্গ করে। দ্বিতীয়তঃ রঙ্গরস— এ গানে কোন সমালোচনা নেই নির্মল হাস্যরস সঞ্চারই এ গানের উদ্দেশ্য। ভোজনলোলুপতা নিয়ে তিনি রঙ্গরসের সৃষ্টি করেছেন— 'আহা, ক্ষীর হত যদি ভারত জলধি,/ ছানা হত যদি হিমালয়/ আহা পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু/ সুবিধা হত মহাশয়'। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাস্তবধর্মী এবং বহির্মুখী। কল্পনা শক্তিকে তিনি ব্যবহার করেন

বাস্তবতার অনুষঙ্গে। তাঁর হাসির গানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল— কাহিনীর শেষে একটি Moral যোগ করা, অন্ত্যমিলের যোগে রস সৃষ্টি করা। যেমন— 'কোকিল কালো ভোমরা কালো/ আমরা কালো তোমরা কালো/মুচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো'। ভোমরা, তোমরা-র ডোমরা কালোর বিচিত্র ধ্বনিগত মিলে তাঁর বাস্তব সম্মত বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। কৃষ্ণ বলে, 'এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু'/ আর-রাধা বলে, 'হ্যাঁ, আজ সাবান মাখিনি ত তবু/ নইলে আরও শাদা'। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে উৎকট-মধুর, লঘু-গুরু, সম্ভব-অসম্ভব রসসমূহের সমাবেশ দেখা যায়। তাঁর হাসির গানের গায়ন শৈলী পাশ্চাত্য সংগীতের আঙ্গিক-নির্ভর। সুরের গঠন, বিন্যাস অপ্রচলিত সুরের প্রক্ষেপণ হওয়ায় গানগুলো জনপ্রিয় হলেও সাধারণ গড়পড়তা গায়কদের পরিবেশন উপযোগী নয়।

স্বদেশপ্রীতি : উনিশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের আবহে বাংলা স্বদেশী গানের সূত্রপাত। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ ধ্যান এর ধারাবাহিক চেতনার উৎসার। দ্বিজেন্দ্রলালের একুশ বছর বয়সে দেওঘরে বসবাস কালে হিন্দুমেলার স্বদেশী প্রচারক রাজনারায়ণ বসুর সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। তাঁরই প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের মনে স্বদেশচেতনা গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়। বিলাত যাত্রার আগে 'আর্যগাথা'র গানে এই উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায়। 'Lyrics of Ind'—কাব্যের মূল সুর স্বদেশিকতা। হাসির গান ও সামাজিক প্রহসন, ব্যঙ্গ ও আত্মোপলব্ধিতে এক ধরনের স্বদেশবোধের প্রসার ঘটে। এছাড়া জাতীয়তাবোধের ভিত্তি থেকে অতীতের জন্য গৌরববোধ, নৈসর্গিক বর্ণনা, পরাধীনতার হতাশা, জন্মধন্যতাবোধ, আত্মশক্তিতে বলিয়ান হওয়ার আহ্বান প্রভৃতি স্বদেশ গানের বিষয়। আর্যগাথার ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন: 'যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রমাত্র কখন সিক্ত হইয়া থাকে, আর্যগাথা তাঁহারই আদর চাহে'। আর্যগাথায় প্রকাশিত সংগীতে বলেছেন, 'গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সংগীত মোর/ ঘুমায়েছে আর্যজাতি ভাঙ্গিব সে ঘুমঘোর'। তাঁর চির আরাধ্য দেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহ বিষয়ে এ সংকলনে কয়েকটি রচনা আছে। দিলীপকুমার রায় মনে করেন ঃ 'দেশের দুর্দশায় তিনি বরাবরই গভীর দুঃখ পেলেও শুধু হাসি ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে আমাদের নানা হীনতার ক্ষুদ্রতার ও গোঁড়ামির ছবি এঁকে তৃপ্তি পাননি। এ তো হল না-র দিক নঞর্থক দেশসেবা। হাঁ-র দিক ওরফে সদর্থক দেশসেবার জন্য তিনি উৎসুক হয়ে উঠে ক্ষেত্র পেয়ে গেলেন রাজপুতদের দেশভক্তি ও বীরত্বের কাহিনীতে টড্ এর 'রাজস্থান'-এ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হল— এক, আদর্শ বীরের চরিত্র চিত্রণে; দুই, রাজপুত দেশপ্রেমিকদের

দেশের জন্য দুঃখ বরণের বর্ণনায়; তিন, স্বদেশী গান রচনায়'৫। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা স্বদেশী গান রচনার যে জোয়ার এসেছিল তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান অসামান্য। এ সময় তিনি প্রচুর স্বদেশী গান রচনা করেন। সে সময়ে রচিত তাঁর 'বঙ্গ আমার জননী আমার' ও 'ধনধান্য পুষ্পভরা' প্রভৃতি গান বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সে সময় রচিত তাঁর দেশভক্তির নাটক প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯) অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বেশিরভাগ বিখ্যাত স্বদেশী গানগুলো এ নাটকগুলোতে আছে। স্বদেশের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অত্যন্ত আবেগতাড়িত ও স্পর্শকাতর। স্বদেশের আদর্শ রক্ষা ও স্বাধীনতা তাঁর কাছে আত্মজীবনের চেয়েও মূল্যবান ছিল। স্বাদেশিকতা ছিল তাঁর সারা জীবনের এক অত্যাজ্য আদর্শ।

প্রেম : দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বভাবে রোমান্টিক ও ভাবাবেগপূর্ণ। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, বহুপঠন বিলাসী, তেজী, একরোখা, তেজোদৃপ্ত ও স্পষ্টবাদী। তাঁর মধ্যে বাস করতো এক স্বতঃমুগ্ধ শিশুর মন। স্বল্পে যা উত্তেজিত হতো, উজিয়ে উঠতো আবেগ ও সমর্পণে। গার্হস্থ্য জীবনে সুখী দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সামাজিক মেলামেশায় তৎপর, মজলিশি অতিথিপরায়ণ ও ভোজনরসিক। গায়ক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। বিবাহান্তে অনেকগুলো প্রেমের গান ও হাসির গান রচনা করে আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ষোল বছরব্যাপী মধুর শান্ত সমর্পিত দাম্পত্য জীবন তাঁকে পূর্ণ করে রেখেছিল। এই কাল পর্বেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি রচিত হয়েছে, জেগে উঠেছে বিপুল গানের তরঙ্গ। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যবাণী কোন বিশেষ কল্পনার মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশপ্রবণ ছিল না। কিন্তু তাঁর কল্পনা শক্তি ছিল না, এ কথা বলা চলে না— 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে/প্রিয়তম তুমি আসিবে'— গানটিতে প্রিয়তমের আগমন প্রত্যাশার গাঢ়তর অনুভূতি এবং মিলন ব্যাকুলতা কল্পনায় অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। 'সারা সকালটি ব'সে ব'সে, এই সাধের মালাটি গেঁথেছি' গানে আছে সারা সকাল ধরে অনেক যত্নে সমর্পণে গাঁথা মালাটির কথা। তাঁর প্রেমের গান মধুর দাম্পত্য জীবনের অবিমিশ্র আনন্দের অনুভূতি। 'যেন একটা লাগাও ছুট/ যেন একটা অবিশ্রান্ত গীতি/ যেন একটা মলয় হাওয়া/ যেন শুদ্ধ ভেসে যাওয়া/ যেন একটা স্বপ্ন-রাজ্য স্থিতি/ এ জীবনে সে সুখ পরম/ সর্বাধিক সুখের চরম/ সে সুখে নাই কলঙ্ক কি ত্রুটি'। দ্বিজেন্দ্রলালের বাইরের জীবন আর ভেতরের জীবন দু'রকমের ছিল, যতদিন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন। চাকরিক্ষত্রে তাঁর নিত্য

প্রতিরোধ, স্পষ্টোক্তি ও আইনের লড়াই। আর বাড়িতে ছিল সুখের দাম্পত্য জীবন, বন্ধুসঙ্গ, গান আর আমোদের আসর। দ্বিজেন্দ্রলাল স্ত্রীর সান্নিধ্য প্রসঙ্গে অকপটভাবে লিখেছেন; 'অপমানে খিন্ন প্রাণে পড়তাম যখন এসে/ তাহার কাছে লুটে/ শান্তি সুধারাশি দিয়ে ধুয়ে দিত ক্ষত কোমল করপুটে/ বাণবিদ্ধ পাখীর মত বহির্জগত হতে/ আসতাম যখন নীড়ে/ তখন নিত প্রাণের মধ্যে আমারে সে গভীর স্নেহ দিয়ে ঘিরে। দাম্পত্য প্রণয়ের মধুর সাহচর্য আমাদের উপহার দিয়েছে অনেকগুলো প্রেমের গান— 'তুমি বাঁধিয়ে কী দিয়ে রেখেছো হৃদি এ/ আমি পারি না যেতে ছাড়ায়ে/ এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর/ চির-বাঞ্ছিত কারা এ'। ষোলবছর সুরবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর প্রণয়মধুর দাম্পত্যে ছিল শান্ত স্নিগ্ধ গৃহকোণ, উৎসাহী মরমী বন্ধুসঙ্গ, সৃজনের অবিরল ধারা। এই পর্বেই নদীর স্রোতের মতো নেমে এসেছে তাঁর বিচিত্র প্রতিভার তীব্র তরঙ্গাবেগ। এই সময় প্রকাশিত হয়েছে কাব্যপর্যায়ে 'আর্যগাথা, ২য় খণ্ড' (১৮৯৩), 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯), 'মন্দ্র' (১৯০২), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), এবং অতি জনপ্রিয় তাঁর 'হাসির গান' (১৯০০)। এরপর ১৯০৩ সালে আকস্মিক পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উজ্জ্বল সৃজন-সমৃদ্ধির সমাপন ঘনিয়ে আসে। এরপর জীবন বলতে তিনি বুঝেছেন শুধু জীবনধারণ, সুখ বলতে মনে হয়েছে ফাঁকি, জায়মান অস্তিত্বের বদলে মহাসিন্ধুর ওপারের সংগীত তাঁকে টেনেছে। অথচ স্ববিরোধ এইখানে যে তিনি সত্যি সত্যিই উদাসী হতে পারেননি স্বভাবে ও কর্মে।[৬] তিনি নাটকরচনা ও নাট্যগীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), মেবারপতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) প্রভৃতি মঞ্চসফল নাটক রচনা করেন। হাসির গানের উৎস গেছে শুকিয়ে, প্রেমসংগীত দুর্লভ, কেবল নাটকের গান এসেছে নাটকের প্রয়োজনে।

সুরবৈশিষ্ট্য ঃ দ্বিজেন্দ্রলালের গান মেলডি প্রধান। স্বরের বিন্যাস ও চলন আধুনিক। তাঁর গানে রাগরাগিণীর সঙ্গে বিলাতী সুর সহজে মিলেমিশে বাংলা গানে এক অভিনব মাত্রা যোগ করেছে। বিলাতে প্রবাস কালে তিনি নিয়মিত বিলাতী গানের চর্চা করতেন। তিনি ১৩টি স্কচ গান, ১৫টি ইংরেজি গান এবং ৭টি আইরিশ গান অবলম্বনে 'আর্যগাথা' ২য় ভাগের মোট ৩৫ খানি গান প্রণয়ন করেন। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বিলাতী গান ভাঙার সংখ্যা কম। হাসির গান ও দেশাত্মবোধক গানে প্রধানত তিনি বিলাতী গানের চাল প্রয়োগ করেন। বিলাতী সুরের উল্লাস, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। উল্লাস, উদ্দীপনা বলতে বোঝায় দ্রুত মুভমেন্টের সুরবিন্যাস এবং টানা সুরের অনুপস্থিতি। ভারতীয় রাগরাগিণীতে

বৈচিত্র্যের অভাব অনুভব করেছিলেন তিনি। ভারতীয় পত্রিকায় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ইংরেজী ও হিন্দুসঙ্গীত' নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন ইংরেজি গানে আবার যেরূপ ভাবের বৈচিত্র্য আছে, হিন্দু-সঙ্গীতে তাহা নাই। কি করুণ, কি প্রেম, কি হাস্য, কি বীর, সব রসই ইংরেজি গানে আছে। সব রাগই ইংরেজি গানে আছে। 'Some Folks' ইংরেজি গান অবলম্বনে তিনি রচনা করলেন, কেউ কেউ করে হায়/ কেউ কেউ করে কেউ কেউ করে/ কেউ কেউ মরতে চায়। গানটি দ্রুত লয়ে গাইতে হয়। কখনও যেমন উচ্চারণের দ্রত চালে, কখনও হঠাৎ ধীর লয়ে কখনও নানা স্কেলে। দুটি আইরিশ গান (Go where glory waits thee ও Robin Adair এবং দুটি স্কচ গান Auld lang syne ও Ye banks and braes ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুজনেই গান রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সমসাময়িক গান ভেঙে বেশ কিছু গান রচনা করেন। মেঘমল্লার রাগে রচিত ঘনঘটা ঘেরি আই কারী কারী ঘনঘটা অবলম্বনে 'দুর্গাদাস' নাটকে রাজিয়ার কণ্ঠের জন্য রচিত গান ঘনঘোর মেঘ আই ঘেরি গগন। সিন্ধুরা টপ্পা 'এসো যদি খেলবে হরি, নারীর সনে হোলিখেলা' ভেঙে 'ভীষ্ম' নাটকের জন্য রচনা করেন প্রকৃতি-বিষয়ক বিখ্যাত গান 'আইল ঋতুরাজ সজনী/ জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী' গানটি। ঝিঁঝট খাম্বাজে রচিত 'তারিণী গো মা, কেন সিঙ্গির সাথে এত আড়ি' গানটি ভেঙ্গে 'পরপারে' নাটকের জন্য রচনা করলেন বিখ্যাত শ্যামা সংগীত 'এবার তোরে চিনেছি মা'। জাতীয় ভাবোদ্দীপক স্বদেশী কোরাস গানগুলোতে রাগরাগিণীর সাথে পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে উদ্দীপনার নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন যেমন— ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা (বাংলায় প্রথম মারচিং সং)- ভূপালী ঠাট/ ধন ধান্যপুষ্প ভরা-কেদারা ঠাট/যেদিন সুনীর জলধি হইতে ভূপকল্যাণ ঠাট/ কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ/ বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ প্রভৃতি গানের সুর সরল কিন্তু ছন্দতালের ওজস্বী বিন্যাস স্বরের সঞ্চলন, স্বরগ্রামের পরিধি বিস্তৃত। এতে কেবল উদ্দীপনা নয় সুরের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার ঘটেছে। এখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের সুর মিশ্রণের সার্থকতা। গানগুলোর ভাষা বলিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত সুর এর অনুগামী হয়েছে। আমরা এমনি এসে ভেঙ্গে যাই ছন্দবহুল এ গানটির সুরের ক্রমারোহণের পদ্ধতি পাশ্চাত্য ঢং-এর। দ্বিজেন্দ্রলালের সাঙ্গীতিক আদর্শ ছিল টপখেয়াল, সেই সঙ্গে কীর্তন ও লোকসুরে গান রচনা করেছেন। টপ্ খেয়ালধর্মী তাঁর গান মীড়প্রধান ও অলংকারময়। কিন্তু আধুনিক কালে তাঁর গান গাওয়া হয় অনেকটা সরলীকরণে, কখনো মুক্ত ছন্দে। তাঁর প্রেমের গান প্রেমভাবনার অন্তঃমগ্ন বিষাদময়তার প্রকাশ।

তীব্র উচ্চকিত তাল নয়, টানা সুরের চলন টপ্পার দানার সঙ্গে মিলে এক প্রকার করুণ মধুর রসের সৃষ্টি করেছে। যেমন— 'আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার'– ঝিঁঝিট্ যৎ/ 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে'– নটমল্লার, যৎ/ 'আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে'– খাম্বাজ, একতাল/ 'আমি সারা সকালটি বসে'– ইমন-ভূপালী একতাল/ 'তোমারেই ভালবেসেছি আমি'– রাগেশ্রী, আড়া প্রভৃতি। তিনি সুরকে বাণীবাহিত ভাবের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন। রাগসুরের সাথে কীর্তনাঙ্গ সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে রচনা করলেন বিখ্যাত গান 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে' এবং বাউল সুরে রচনা করেছেন 'একবার গালভরা মা ডাকে' গানটি। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তাঁর গানের স্বরলিপি সংরক্ষণ ও সম্প্রচারের ব্যাপারে উদাসীন। তাঁর শেষ দশ বছর (১৯০৩—১৯১৩) কেটেছে নাটক রচনা ও নাটকের গান রচনায়। এসব গান গীত হত রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কণ্ঠে। জনপ্রিয়তার ফলে অগণিত অদক্ষ কণ্ঠে গায়নের কারণে এসব গানের প্রকৃত রূপ জানা যায় না। ১৯০৩ সালে চল্লিশ বছরে পত্নিবিয়োগ-আঘাত তিনি বাকি দশ বছরে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ ও স্নেহশীল, স্বভাবে সৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্টিক।

উপসংহার : হাজার বছরের বাংলা সংগীতের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নাম। বিষয়বস্তু, ভাবপরিমণ্ডল, রচনারীতি, সুর বৈশিষ্ট্য ও গায়ন-শৈলীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা সংগীতের ধারায় সঞ্চার করেছেন প্রাতিস্বিক মাত্রা। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির চিরায়ত আনন্দ বেদনা ও আশা-আশ্বাসের এক স্ফটিক সংহত রূপ দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত।

তথ্যসঙ্কেত

১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৬৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬৬, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা ৪৪।

২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪।

৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫।

৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৭।

৫। সুধীর চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ, পুস্তক বিপণী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬৯।

৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭।